Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 247 - 254
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

জানা অজানায় বাঁকুড়া জেলার লোক উৎসব : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা

শাশ্বতী সেনগুপ্ত
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক
Email ID: shaswatisengupta80@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Fock festival, Rural, Nature, Tribal, Tradition, Diversity, God, Ritual, Puja.

Abstract

Bankura district is located in the western tip of West Bengal. The climate of this district is mainly harsh and dry. Seemingly festivals add another dimension to this ordinary public life and it is needless to say that the festival creates a new excitement in the life of the masses. The diverse folk festivals here make the district special. Despite the great adversity of nature, the people of Bankura overcame the hardships and floated in the tide of folk festivals. Festivals are also filled with joy, dance, and many more folk rituals. The contribution of these folk festivals is very important for rural public life. There are a lots of folk festivals are found in the Bankura district. The folk festivals here have created a unique cultural atmosphere in their diversity and characteristics. It is difficult to record it in a single effort. Hence, this article highlights some of the most prevalent and popular folk festivals of Bankura district. Among those, the coexistence of nature and tradition can be observed through the popular folk festivals of the tribal community, such as Baram, Karam, Bejabendha, Saharai, Chhata Parab, Baha Parab etc. On the other hand, the popular folk festivals of other local communities, such as Shivagajan, Dharmagajan, Jhapan, Dussehra, Shial-Shakuni Puja, Bhadu Parab, Tusu Parab, Indparab etc. makes an indescribably beautiful co-existence of devotees, devotion, God, and folklore make the mind happy with natural thoughts. In several pujas, the devotion of the devotees to the purpose of the Lord is also unparalleled. Nirambu upobas, Dandi khata, Dhuno porano, Agune jhap, Hul forano, Banfore, Hotye etc. Besides the religious rituals, the sky is resounding with the singing of God's name. As an accompaniment to folk festivals, they acquire another dimension with dance, song, and music.

Discussion

বাঙালি উৎসব প্রিয় জাতি। আর উৎসব প্রিয় বাঙালির জীবনে লোক উৎসব যে অন্য মাত্রা যোগ করে একথা বলাই বাহুল্য মাত্র। লোক সাধারণের দৈনন্দিন, একঘেঁয়েমিতে পূর্ণ জীবনে লোক উৎসব নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। ফলস্বরূপ মেলে মুক্তির

স্বাদ, বাঁচার রসদ। বাঁকুড়ার রুক্ষ শুষ্ক প্রকৃতিও মানুষের সঙ্গে মেতে ওঠে বিভিন্ন লোক উৎসবে। সুদৃঢ় হয় যুগে যুগে সঞ্চিত পরম্পরা ও মানব হৃদয়ের বন্ধন। মধ্য রাঢ়ের অন্তর্গত বাঁকুড়া জেলার জনজীবনে এই লোক উৎসব বিশেষ মাত্রা যোগ করে। প্রায়শই অনাবৃষ্টি ও খরা কবলিত এই জেলায় দারিদ্র্য, দুঃখ, কষ্ট, ক্ষুধা, তৃষ্ণা পীড়িত লোক সাধারণের জীবনে বিষন্নতার কালো মেঘ ঘনিয়ে এলেও উৎসবের প্রাণ প্রাচুর্য তাতে আাশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, আবেগ, বিশ্বাস, মূল্যবোধে নতুন ভাবে জীবনের পথে চলার প্রেরণা যোগায়। জীবন ছন্দকে করে তোলে আরো গতিময়।

বাঁকুড়া জেলার লোক উৎসবের সংখ্যা অগণন। এখানকার লোক উৎসবগুলি নিজ বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে এক অপরূপ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল রচনা করেছে। একক প্রচেষ্টায় তা লিপিবদ্ধ করা দুষ্কর। তাই বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় লোক উৎসবগুলির মধ্যে নির্বাচিত কয়েকটি সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই জেলায় যেসব লোক উৎসবগুলি পালিত হয় তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আদিবাসীদের লোক উৎসবগুলির কথা। আদিম অরণ্যচারী ও প্রকৃতির সান্নিধ্যে লালিত হওয়ায় তাদের লোক উৎসবগুলিতে প্রকৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যুগ যুগ সঞ্চিত পরম্পরায় আনন্দোৎসবেও ঈশ্বর ও পূর্ব পুরুষদের স্মরণ করা হয়। আদিবাসী সমাজে ব্যক্তি অপেক্ষা সমষ্টিই প্রাধান্য পায়।

বড়াম - আদিবাসীদের রক্ষাকারিনী দেবী হলেন 'বড়াম বা বড়াম বুড়ি'। বাঁকুড়া জেলায় শক্তিশালিনী এই দেবীর সেরকম অর্থে কোন মন্দির নেই। জেলার বেশিরভাগ প্রত্যন্ত আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে খোলা আকাশের নিচে গাছের তলায় এই দেবীর অবস্থান। চলতি কথায় এগুলিকে 'থান' বলা হয়। সেখানে দেবীর কোন মূর্তি থাকে না। জেলার বেশিরভাগ অঞ্চলে মাটির তৈরি হাতি-ঘোড়ার প্রতীকেই দেবী পূজিত হন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে শিলাখন্ডকেও বড়াম বুড়ির প্রতিমূর্তি স্বরূপে পূজো করা হয় -

> "...বাঁকুড়ার অজপল্লী অঞ্চলে প্রতীক রূপে হাতি, ঘোড়া বা শিলা খন্ডও পূজিত হয়।"[১]

অনেক লোকসংস্কৃতিবিদই মনে করেন আদিবাসী নয়, ভূমিজরাই এই দেবীর পূজোর প্রথম প্রচলন করেন। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় লোকসংস্কৃতিবিদ মিহির চৌধুরী কামিল্যা মহাশয়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য -

> "একদা তিনি ছিলেন ভূমিজদের দেবতা। বৈতল, বালিঠা, গোপীবল্লভপুর, শিহড় প্রভৃতি গ্রামে ভূমিজরাই তাঁর প্রধান উপাসক। মকরসংক্রান্তিতে তাঁর বার্ষিকী। এদিন শুকর বলি হয়। থানে বসে সকলে অন্নপ্রসাদ নেয়। বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষার্থে তাঁর পূজা। জানডাঙ্গা, লেদরা, পড়াশ্য, কালুডি, জানকিবাঁধ প্রভৃতি স্থানে তিনি পশুরক্ষাকারিনী।"[২]

বছরের একটি নির্দ্দিষ্ট দিনেই এই দেবীর পূজা করা হয়। মূলত মকরপরব বা পৌষ সংক্রান্তির দিন ধূমধামের সঙ্গে দেবীর পূজা হয়। 'দেহেরী' সম্প্রদায়ের লোকেরা পূজায় পৌরোহিত্য করেন। নৈবেদ্য হিসেবে আতপ চাল, চিঁড়ে, গুড় ও ফলমূল নিবেদনে করা হয়। সেই সঙ্গে ছাগ, মুরগী বা শূয়োর বলি দেওয়ার নিয়ম আছে। এমনকি পানীয় হিসেবে দেবীর উদ্দেশ্যে 'হাঁড়িয়া' (মদ) উৎসর্গ করা হয়। পূজোর শেষে ভক্তরা অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। পূজার রাতে নারী ও পুরুষের ধামসা-মাদলের দ্রিমি দ্রিমি তালে নৃত্য ও গীত এই পূজার একটি অন্যতম আকর্ষণ।

করম পরব - আদিবাসী সম্প্রদায়ের কৃষিভিত্তিক লোকউৎসব হল 'করম পরব'। করমকে 'করম রাজা' বা 'করম গোঁসাই' নামেও ডাকা হয়। এই 'করম' মূলত 'যৌবন ও শান্তির' প্রতীক। বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ, খাতড়া, হিড়বাঁধ, পুখুরিয়ায় জাঁকজমক সহ 'করম পরব' পালিত হয়। সাঁওতাল, ভূমিজ, কোল, মুন্ডা, মাঝি, কুড়মি প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভালো ফলনের আশায় এই পূজা করে থাকেন। সাধারণত ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই উৎসব পালিত হয়। পুরুষেরা সকালবেলা বন থেকে শালগাছের দুটি ডাল কেটে এনে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুঁতে রাখে। সন্ধ্যার সময় পূজা শুরু হয়। এই পূজায় কুমারী মেয়েরা উপোসী থাকে। সন্ধ্যাকালীন এই পূজায় ফুল, ফল ও জাওয়া ডালার নৈবেদ্য সহকারে আরাধনা করা হয়। পূজো শেষে সকলে ব্রতকথা শোনেন। কিশোরীরা করম রাজার কাছে প্রার্থনা জানায়- 'আমার করম, ভাইয়ের ধরম'। এর অর্থ যেটুকু জানা গেল, ভাইয়ের কৃষিকাজ জাত ফসল রক্ষায় করম রাজার কাছে এটি বোনের প্রার্থনা। 'তাহিরে' হল করম পূজার একটি অন্যতম আকর্ষন-

> "করম খিচুড়ি খেতে ভালবাসে, এ খিচুড়ি একটু অন্য রকমের হয়, -ডাল চাল ও বলির পশিপক্ষীদের মাথা দিয়ে তৈরী।"[৩]

আদিম প্রথায় শ্বাসরূদ্ধ করে ছাগ ও পায়রা বলি দেওয়া হয়। সারারাত ধরে চলে নাচ-গান। করম পূজার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হল 'জাওয়া ডালা'। এই ডালায় থাকে তেল ও হলুদ মাখানো অঙ্কুরিত মুগ, ছোলা, মটর এবং কুত্থির বীজ। পরদিন সকালে কুমারীরা বাড়ির বিভিন্ন স্থানে জাওয়া ডালার এই বীজগুলি ছড়িয়ে দেয়। করম ডাল দুটিকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর কুমারী মেয়েরা পরস্পরের হাতে 'করম ডোর' বেঁধে বিপদে একে অপরের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে। বর্তমানে 'করম পরব' উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়।

ছাতা পরব - বাঁকুড়া জেলায় বৃষ্টির দেবতা বরুণের পূজা হল 'ছাতা পরব'। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অতিবৃষ্টির প্রকোপ থেকে শস্য রক্ষার জন্য বরুণদেবের উদ্দেশ্যে ছাতা ধরে বৃষ্টি বন্ধের প্রার্থনা জানানো হয়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন শস্যহানি থেকে রক্ষায় এই পূজা করে থাকেন। বাঁকুড়া জেলার সিমলাপালের 'ছাতা পরব' সব থেকে জনপ্রিয়।

সহরায় ও বাঁধনা পরব - আদিবাসীদের একটি অন্যতম জনপ্রিয় আনন্দোৎসব হল সহরায় ও বাঁধনা পরব। মূলত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ভালো ফসলের প্রার্থনায় সহরায় পালন করে থাকে। এই সময় ঘর-বাড়ি গোবর, মাটি প্রভৃতি দিয়ে নিকানোর পর বিভিন্ন রকমের আলপনা দেওয়া হয়। তবে সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় আলপনার বাহার জেলার দক্ষিণাংশেই বেশি দেখা যায়। সাধারণত কার্তিক মাসে কালীপূজার সময় সহরায় ও বাঁধনা পরব পালিত হয়। আগে পাঁচদিন ধরে এই উৎসব পালন করা হত। তবে বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ সাঁওতাল পল্লীতে এই উৎসব চারদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন পালিত হয় 'উম্'। এদিন জাহের থানে পূজা করে পরবের শুভ সূচনা করা হয়। দ্বিতীয় দিন পালিত হয় 'বঙ্গা'। এদিন পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের পিঠা ও হাঁড়িয়া উৎসর্গ করা হয়। তাছাড়া ফসলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত গরুও তাদের এই উৎসবে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই উৎসবের তৃতীয় দিন পালিত হয় 'খুঁনটাউ'। এদিন গোয়াল ঘর পরিস্কার করা হয়। গরুকে স্নান করিয়ে ও শিং-এ তেল-সিঁদুর মাখিয়ে পরিচর্যা করা হয় এবং সারা শরীরে বিভিন্ন রঙের ছাপ দেওয়া হয়। গলায় গাঁদা ফুলের মালা ও মাথায় মৌড় বা ধানের শীষের গোছা দিয়ে তৈরি মুকুট দ্বারা ভালোভাবে সাজিয়ে সন্ধ্যার সময় পূজার্চনা করা হয়। এদিন গরুকে খুঁটিতে বেঁধে তার সঙ্গে খেলা চলে। স্থানীয় ভাষায় একে 'গরুখুঁটা' বলে। চতুর্থ বা শেষ দিনে পালিত হয় 'জালি'। এদিন পুকুর থেকে মাছ ধরে রান্না করা হয়। সবাই আনন্দভোজে অংশগ্রহণ করে। এরপর সকলে নাচে গানে মাতোয়ারা হয়। এছাড়া বাঁধনা উপলক্ষে আদিবাসী পরিবারের পাশাপাশি বাঁকুড়ার বিভিন্ন গৃহস্থ পরিবারেও মেয়ে-জামাইকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং নতুন জামাকাপড় দেওয়া হয়। এদিন বাগাল বা রাখালকেও নতুন বস্ত্র দেওয়ার চল আছে।

বেজাবেঁধা - 'বেজাবেঁধা' কথার অর্থ হল 'তিরবিদ্ধ বা শরবিদ্ধ করা'। প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীদের শিকার উৎসবই হল 'বেজাবেঁধা'। বাঁকুড়া জেলার অরণ্যচারী আদিবাসীদের কাছে একসময় শিকারের বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক ছিল। তারা প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে আকছার শিকার করত। যদিও বর্তমানে এ জেলায় বসবাসকারী বেশিরভাগ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। বাঁকুড়ার রানিবাঁধ, রাইপুর, সোনামুখী, সারেঙ্গা প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় মকর পরবের পরের দিন অর্থাৎ ১লা মাঘ 'এখ্যান যাত্রা' হিসেবে পালিত হয়। এদিন তারা আনন্দ ভোজে মেতে ওঠার জন্য শিকারে যায়। শিকার করা পশুপাখির মাংস খেয়ে উৎসব পালন করে। বর্তমানে বনভূমির ঘাটতি ও বন্যপ্রাণী হত্যায় আইনি নিষেধাজ্ঞার জন্য এই উৎসব প্রায় বিলুপ্তির পথে। তবে এই উৎসব উপলক্ষে এখনো 'এখ্যান' দিনে মাংস খাওয়ার রীতি আছে।

বাহা পরব - 'বাহা' শব্দের অর্থ হল 'ফুল'। এটি মূলত আদিবাসী সাঁওতালদের ফুলের উৎসব। মুন্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উৎসব 'সাহরুল' নামে পরিচিত। বাহা পরবের মধ্যে দিয়ে সাঁওতালদের নতুন বছরের সূচনা হয়। এই পরবের সুনির্দিষ্ট কোন তিথি নেই। মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার পরবর্তী সময়েও এই উৎসব পালিত হয় -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 247 - 254
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আগে মাঘী পূর্ণিমায় এখন ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্যার যে কোনও একদিন বাহাপরব পালন করে বাঁকুড়ার আদিবাসী গোষ্ঠী।"[৪]

এই উৎসবে শাল ও মহুয়া ফুলেরই বেশি প্রয়োজন হয়। প্রকৃতি এসময় নিজেকে নতুন রূপে সাজায়। তাই বাহা পূজার উপকরণ হিসেবে তারা প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত গাছের নতুন পাতার থালায় নতুন ফুল-ফল সহ অন্যান্য পূজা সামগ্রী দেবতাদের উদ্দেশ্য নিবেদন করে এবং পূজা সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে সেই সব সামগ্রী ব্যবহার করে। বাহা পরবে মূলত সাঁওতালরা তাদের দেবতা মারাং বুরু, মড়েক তুরুইক, জাহের আয়ুর উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করে থাকেন। ভালো ফসল, গৃহপালিত পশুদের সুস্থতা এবং পরিবার ও গ্রামের সকলের মঙ্গলকামনার প্রার্থনা জানানো হয়। তিন দিন ধরে 'বাহা পরব' পালন করা হয়। পরবের প্রথম দিন পালিত হয় 'উম্ মাহা'। এদিন মূলত ঘর-বাড়ি সহ পূজাস্থল 'জাহের থান' পরিস্কার করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শালগাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছোট একচালা খড়ের ছাউনিকে 'জাহের থান' বলা হয়। বাহা পরবের মূল অনুষ্ঠান দ্বিতীয় দিন পালিত হয়। একে 'সার্দি মাহা' বলা হয়। সারাদিন উপবাসে থেকে পূজা সম্পন্ন করা হয়। এই পূজায় হাঁস, মুরগী প্রভৃতি বলি দেওয়ার রীতি আছে। দেবতার উদ্দেশ্যে খিচুড়ি ভোগও নিবেদন করা হয়। পূজার প্রসাদ হিসেবে সকলে খিচুড়ি ও মাংস খায়। সেই সঙ্গে নাচ, গান ও ধামসা-মাদলের মাদকতা এই উৎসবে অন্য মাত্রা যোগ করে। পরবের তৃতীয় তথা শেষদিনে পালিত হয় 'বাস্কে মাহা'। এদিনের বিশেষ আকর্ষণ হল 'জল খেলা'। এই খেলা হোলি খেলার আদলেই হয়। তবে জলে কোনরকম রঙ মেশানো হয় না। কেবলমাত্র একে অপরের গায়ে জল ঢেলেই সকলে এই খেলায় মেতে ওঠে।

শিবের গাজন - হিন্দুদের দেব-দেবীর মধ্যে শিব যে সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা একথা বলাই বাহুল্য মাত্র। ভারতের প্রায় সর্বত্রই যেমন শিব মন্দিরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় ঠিক তেমনিই বাঁকুড়া জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়-

> "শিবমূর্তি বা শিবলিঙ্গ পূজিত হয় না এমন গ্রাম এ জেলায় দেখা যায় না।"[৫]

সাধারণত সারা বছর শিব পূজা হলেও চৈত্র ও বৈশাখ মাসে এই জেলার বিভিন্ন স্থানে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়-

> "ধর্মানুষ্ঠান ও উৎসবাদির মধ্যে শীর্ষস্থানের অধিকারী 'শিব গাজন'। চৈত্র-বৈশাখ মাস জুড়ে এ জেলার গ্রামগুলি শিবনামে মুখর হয়ে ওঠে।"[৬]

বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বর, ডিহর, জগন্নাথপুর, পাত্রসায়ের, রাইপুর, সারেঙ্গার গাজন বিশেষ জনপ্রিয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আরাধ্য মহাদেব এক্তেশ্বর, মল্লেশ্বর, বুড়া বাবা, সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজিত হন। শিবগাজনকে কেন্দ্র করে মানুষের ভক্তি ও আবেগও লক্ষণীয়। আর্য-অনার্যের মিলন এই উৎসবের প্রাণ। তাছাড়া আরাধ্য দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করার জন্য ভক্ত্যাদের দৈহিক কৃচ্ছসাধন চোখে পড়ার মতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গাজনের ব্রত পালনকারীদের 'ভক্ত্যা' বলা হয়। দন্ডীখাটা, বাণফোঁড়, কাঁটাঝাঁপ, আগুনঝাঁপ, পাটভক্ত্যা, ধুনো পোড়ানো, হত্যে দেওয়ার মাধ্যমে ভক্তের মনোবাসনা পূরণের আকুলতায় 'শিবমণি নাথমণি মহাদেব' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। বাঁকুড়া জেলার এক্তেশ্বরের শিব গাজন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এছাড়াও বড়জোড়া ব্লকের জগন্নাথপুর গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব গাজন উপলক্ষে ভক্ত্যাদের নারীবেশ ধারণ এই পরবে অন্য মাত্রা যোগ করে।

ধর্মগাজন - বাঁকুড়া জেলার একটি অন্যতম প্রধান লোক উৎসব হল 'ধর্ম গাজন'। এই ধর্মঠাকুর আবার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কালু রায়, ক্ষুদি রায়, বাঁকুড়া রায়, রূপনারায়ণ, স্বরূপনারায়ণ, যাত্রাসিদ্ধি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। এমনকি অনেকেরই অভিমত এই বাঁকুড়া রায়ের নামানুসারেই বাঁকুড়া জেলার নামকরণ হয়েছে। বেলিয়াতোড়, মটগোদা, কাপিষ্ঠা, কামারপুকুর সহ জেলার বিভিন্ন গ্রামে ধর্মঠাকুর পূজিত হন। সাধারণত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ধর্মরাজের গাজন হয়। তবে বাঁকুড়া জেলায় ধর্মরাজের কোন মূর্তি নেই। পরিবর্তে কূর্মাকৃতির শিলাখন্ড বা স্থান বিশেষে মাটির হাতি-ঘোড়ার মূর্তি গাছের নিচে 'থান'-এ পূজিত হয়। পূজোয় পায়রা, ছাগ বলি দেওয়ার রীতি আছে। শিবগাজনের মতোই ভক্ত্যাদের মধ্যে বাণফোঁড়া, দন্ডীখাটা, আগুন সন্ন্যাসের মাধ্যমে ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস দেখা যায়। অনেক ভক্ত্যার আবার 'ভর'-ও আসে। সহসা মানব শরীরে দৈবী শক্তির বৈচিত্র্যময় ও স্বল্পকালীন প্রকাশই হল 'ভর'। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মঠাকুরের প্রসিদ্ধি সর্বাধিক। ডোম, লোহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজা সমধিক প্রচলিত হলেও বর্তমানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরাও এই পূজায় যোগদান করেন।

মনসাপূজা ও ঝাঁপান - সর্পদেবী মনসা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজিত হন। বাঁকুড়া জেলার প্রায় সর্বত্রই মনসা পূজা হয়। তবে এই জেলার পূজায় কিছু বিশেষত্বও আছে -

> "জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীর (দশহরা) দিন থেকে ডাক সংক্রান্তি (আশ্বিন সংক্রান্তির) দিন পর্যন্ত মনসা দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় নানা উপচারে জাঁকজমকে গাজন ও মেলার অনুষঙ্গে। সেই সঙ্গে কোথাও একমাস কোথাও চারমাসব্যাপী মনসামঙ্গলের গান ও ঝাঁপান (সাপ খেলার প্রদর্শন) উৎসব চলে।"[৭]

তবে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত মনসা পূজার জাঁকজমক সবচেয়ে বেশি। এই সময় পূজার পরদিন অরন্ধনও পালিত হয়। পরিবারের কল্যাণার্থে তরিতরকারি সহ পান্তা ভাত খাওয়ার রীতি আছে। স্থানীয়েরা এই অরন্ধন পালনের রীতিকে 'রাঁধাবাড়া' বলে থাকেন। এদিন 'মনসাসিজ' নামে এক ধরনের ক্যাকটাস জাতীয় গাছের পূজোও করা হয়। রাতে মনসামঙ্গল গান গাওয়া হয়। মনসা পূজা উপলক্ষে বাঁকুড়ার বিভিন্ন জায়গায় 'ঝাঁপান' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এর ভয়ংকরতা প্রশ্নাতীত। এর মধ্যে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, বেলিয়াতোড়, মানকানালির ঝাঁপান খুবই চিত্তাকর্ষক-

> "বেলিয়াতোড়ে এক সময় খুব জাঁকজমক করে ঝাঁপান হত। বিখ্যাত গুণিন ছিলেন নিবারণ লোহার। মুখোমুখি মাচা বেঁধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। মন্ত্র পড়ে, সাপ উড়িয়ে, গলায় জড়িয়ে, মুখে পুরে ভয়ংকরভাবে লড়াই হয় গুণিনদের মধ্যে।"[৮]

ঝাঁপানে চিতি, সাদা খরিশ, কালো খরিশ, ময়াল, বোড়া, গোখরো প্রভৃতি সাপের খেলা দেখানো হয়।

জীমূতবাহন পূজা ও শেয়াল-শকুনি পরব - ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে (জীতাষ্টমী) জীমূতবাহন ও শেয়াল-শকুনি পূজা হয়। এই পূজায় বাড়ির গৃহিণীরাই ব্রতী হন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই পূজায় পৌরোহিত্য করেন। এই পূজায় নৈবেদ্য হিসেবে পিতলের কলসিতে ভিজে ছোলা ভর্তি করে কলসির মুখে শশা দিয়ে শালুক ডাঁটার তৈরি মালা সহ ফুলটি জড়ানো হয়। জীতাষ্টমীর দিন বিকেলে কোন মন্দির প্রাঙ্গণে সরু বটগাছের ডাল পোঁতা হয়। ডালের গোড়ায় কচি ধান গাছ, হলুদ, মানকচু, আখ প্রভৃতি রাখা হয়। ব্রতীদের হাতে গড়া কাঁচা মাটির তৈরি ছোটো শেয়াল-শকুনি শালপাতার খালা বা ঠোঙায় হলুদ ছোপানো কাপড়ে মুড়ে রাখা হয় এবং সিঁদুর ও কাজল পরানো হয়। এই ব্রতে নিরম্বু উপবাস করেন ব্রতীরা। পরদিন সকালবেলা নিকটবর্তী কোন পুকুর বা জলাশয়ে আকণ্ঠ জলে দাঁড়িয়ে শেয়াল-শকুনিকে ছুঁড়ে ফেলে ছোট ছেলে-মেয়েরা ছড়া কেটে বলে,

> "শিয়াল গেল খালকে
> শুকনি গেল ডালকে
> ও শিয়াল কাঁদিস না
> লোক হাসিটা করিস না।"

এরপর জলে ডুব দিয়ে শশা খেয়ে ব্রত সাঙ্গ হয়। তারপর মেঘ ও সূর্য দর্শন করে প্রণাম করতে হয়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যু ও অশুভত্বের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গৃহিনীরা এই ব্রত পালন করে থাকেন।

ভাদু পরব - বাঁকুড়া জেলার একটি অন্যতম কৃষিভিত্তিক লোক উৎসব হল ভাদু। বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া, ইন্দপুর, হিড়বাঁধ, ইন্দাস, তালডাংরা, সিমলাপাল, সারেঙ্গায় সাড়ম্বরের সঙ্গে ভাদু পরব পালিত হয়। বড়জোড়ায় ভাদু পূজা উপলক্ষে মেলা বসে। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত এই পূজার বিস্তার। ভাদ্র মাসে পালিত হয় বলে এর নাম 'ভাদু'। মতান্তরে বাঁকুড়ার পাশ্ববর্তী জেলা পুরুলিয়ার রাজকুমারী ভদ্রেশ্বরীর অনুষঙ্গ থেকেই 'ভাদু' কথাটি এসেছে। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন ভাদুর জাগরণ হয়। এই পূজায় গীতের প্রাবল্য লক্ষণীয়, মন্ত্র বিশেষ নেই। ভাদুর দেহ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়-

> "ভাদুর আকৃতি অতি সুশ্রী, বর্ণ ঘন হরিদ্রা। টানা টানা দুটি চোখ কপালে লাল টিপ, মাথায় শোলা বা রাংতায় তৈরী বেশ বড় মুকুট। রঙিন শাড়ি (বা ঘাগরা) ফুলকাটা বক্ষ-বন্ধনী পরা। দুটি হাত, এক হাতে মণ্ডা বা সন্দেশ, অন্য হাতে ধানের শিষ কিংবা একটি পান। মূর্তি সাধারণত দু'ফুটের বেশি উচ্চ হয় না। সর্বদা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট দেখা যায়।"[৯]

এই পূজায় মূলত কুমারীরাই অংশগ্রহণ করে। রঙিন কাগজ বা কাপড় দিয়ে তৈরি ভাদুর ঘর শালুক, দোপাটি সহ বিভিন্ন মরসুমি ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সেই সঙ্গে নৈবেদ্য হিসেবে জিলিপি, মন্ডা, মিঠাই, প্যাঁড়া, খাজা দেওয়া হয়। সারারাত গান

গাওয়া হয়। নারীর সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, স্নেহ, বাৎসল্য সহ দৈনন্দিন যাপনচিত্র ভাদু গানগুলির মধ্য দিয়ে ভাষা রূপ পায়। তারা কখনো গেয়ে ওঠে -

"ভাদু আমার গরবিনী
ওগো আমার ভাদুমণি
মাথায় দিব সোনার মুটুক
শাড়ি দিব জামদানী।"

কখনো আবার গায়-

"দেখে যা লো তোরা।
ভাদু দেখে হইছি লো দিশে হারা।।
রূপের ছটা ঘনঘটা লো, আলো, ঘর আঁধার করা
আন্ মনেতে বসে আছে, ঠিক যেন ক্ষেপীর পারা।"

ভাদু গানে অনেক সময় সমাজচিত্রও ফুটে উঠতে দেখা যায় -

"ভাদু টানা বাজারে, যা দিলে সরকারে
সব কিছু নিলে ভাদু গাঁয়ের মেম্বারে।"

এরপর ভাদুর প্রতিমা নদী বা পুকুরে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে পূজা শেষ হয়। বাঁকুড়া জেলার কেঞ্জাকুড়া গ্রামে 'ভাদু পূজা' উপলক্ষে পেল্লাই সাইজের 'জিলিপি' তৈরি করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা একে 'জাম্বো জিলিপি' বলেন। এগুলোর এক একটার ওজন প্রায় দুই থেকে তিন কিলো এবং পাঁচশো থেকে সাতশো টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি করা হয়। এগুলি স্বাদেও অতুলনীয়। এছাড়াও, তালডাংরা ব্লকের বিবড়দা গ্রামে কুমোরের চাকে তৈরি অনিন্দ্যসুন্দর ভাদুর প্রতিমা পাওয়া যায়।

টুসু পূজা ও মকর পরব : বাঁকুড়া জেলার আরেকটি কৃষিভিত্তিক লোক উৎসব হল 'টুসু পরব'। জেলার রানিবাঁধ, খাতড়া, হিড়বাঁধ, ইন্দপুর, শালতোড়া, ছাতনা, সেন্দড়া, জয়পুর, শালডাঙ্গা, বিষ্ণুপুরে ধূমধামের সঙ্গে 'টুসু পরব' পালিত হয়। নৃত্য-গীতে মুখর এই উৎসবে প্রধান ভূমিকায় কুমারী মেয়েরা থাকলেও গৃহবধূ ও বাড়ির বয়স্কা মহিলারাও টুসুগানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি থেকে শুরু করে পৌষ সংক্রান্তিতে এই পূজা শেষ হয়। একমাস ধরে চলে টুসু পূজা। টুসুর রূপ বর্ণনায় পাই-

> "টুসুর মূর্তিবেশ সুন্দর-শাস্ত্রীয় দেবী লক্ষীর মতই রং হলদে, মাথায় রাংতার মুকুট, দুই হাতে দুটি পদ্ম, সারা অঙ্গে নানারূপ গহনা। শোলা, রঙ্গিন কাগজ দিয়ে তৈরী, মাথার পিছনে প্রভামন্ডল বা চালচিত্রের মত একটা জিনিস দেখা যায়, সেটিও চিত্রিত। টুসুদেবীকে দন্ডায়মানই দেখা যায়, এঁর মূর্তি বড় হয় না-উচ্চতায় এক ফুট পর্যন্ত দেখা যায়।"[১০]

টুসু নামকরণটি নিয়েও মতান্তর দেখা যায়। ইতুপূজার পর অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে মাটির সরায় তুষু পাতা হয়। সরাটির গায়ে আলপনা এঁকে আতপ চাল, দূর্বা ঘাস, সরষে ফুল, গাঁদা ফুল ও মূলা ফুল দিয়ে সাজানো হয়। এ থেকেই 'তুষু' নামটি এসেছে বলে মনে করা হয়। আবার অনেকের মতে তুষু>টুসু কথাটি এসেছে। যা বর্তমানে বহুল প্রচলিত।

পৌষ মাসের শেষ তিনদিন স্থানীয়দের কাছে 'চাঁউড়ি', 'বাঁউড়ি' ও 'মকর' নামে পরিচিত। চাঁউড়ির দিন মেয়েরা ঘর বাড়ি পরিস্কার করে 'চাল গুঁড়ি' বা 'চাল গুঁড়ো' তৈরি করে। বাঁউড়ির দিন চাল গুঁড়ি ও বিভিন্ন ধরনের পুর সহযোগে 'গড়গড়্যা পিঠে' বা 'পুর পিঠে' নামে বিশেষ এক ধরনের পিঠে বানানো হয়। পূজায় সন্ধ্যার সময় দেবী মূর্তির সামনে নৈবেদ্য হিসেবে চিঁড়া, গুড়, বাতাসা, জিলিপি, মূলা, মুড়ি, ছোলা ভাজা, মটর ভাজা, মিষ্টি ও বিভিন্ন রকমের ফল দেওয়া হয়। ধূপ, দীপ জ্বালিয়ে মেয়েরা সমবেতভাবে সারারাত গান গায়। এই দিনটিকে 'জাগরণ' বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভাদু ও টুসু গানগুলি মৌখিক ভাবে রচিত হওয়ায় গানের কথায় পার্থক্য দেখা যায়।

টুসু তাদের কাছে শুধু দেবী নয়। কখনো তাদের প্রাণপ্রিয় সখি, কখনো বা আবার সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে বা বধূ। গানের মধ্যে তার প্রতিফলনও দেখা যায়। সখি হিসেবে তারা গেয়ে ওঠে -

"উঠ উঠ উঠ টুসু উঠাত্যেই তো আস্যেছি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 247 - 254
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তুমারি সব সঙতি মোরা টুসু পূজাতে বস্যেছি।”

টুসুকে মেয়ে বা বধূ মনে করে গেয়ে ওঠে -

“আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝলমল করে গো
উয়ার টুসু হ্যাংলা মাগী আঁচল পাত্যে খুঁজে গো।”

আবার, টুসু গানে বাস্তব জীবনের ছবিও প্রতিফলিত হতে দেখা যায় -

“চল লো সবাই রানীগঞ্জ যাব
সেখানে কয়লা কাটার কাজ লিব।”

এই ভাবে এক মাস ব্যাপী টুসুর উপাসনার পর ‘মকর’ বা পৌষ সংক্রান্তির দিন টুসুর বিসর্জন হয়। টুসুর মূর্তি সহ প্রতীক হিসেবে সরাটিকে সাজিয়ে চৌডোল বা চতুর্দোলায় নিয়ে গিয়ে পুকুরে বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এবং সকলে সেখানে স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে। বাঁকুড়া জেলার পরকুল গ্রামে টুসু পরব উপলক্ষে বড় মেলা বসে।

দশহরা - সাধারণত জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে ‘দশহরা’ উৎসব পালিত হয়। এই পূজার বিধি বেশ স্বতন্ত্র-

> “তুলসীতলায় বা অন্য কোন পবিত্রস্থানে বা উঠোনে একটি কাঁচা গোবরের ড্যালার উপর একটি, তিনটি বা পাঁচটি মনসাসিজ পাতা গেঁথে মনসাকে পূজা নিবেদন করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। অথবা মনসাসিজ গাছের তলায় বসেও পূজা হয়, পূজা হয় মনসাথানে। ঐ পূজার সময় দশ দশটি ফল নিবেদন করতে হয়।”[১১]

তবে দশহরা পূজায় মনসা পূজার পাশাপাশি কোন কোন জায়গায় গঙ্গা পূজাও হয়ে থাকে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী দশহরা পূজা করলে দশ জন্মের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সাপের প্রকোপ থেকে বাড়িকে সুরক্ষিত রাখতে জলে গোবর গুলে তা ঘরের বাইরের দেওয়ালের চারিদিকে বৃত্তাকারে দাগ দেওয়া হয়। একে 'দশর বেড়ি' বলে। পূজার দিনে ‘কেলেকোড়া’ ফল খাওয়ার বিধি আছে। এদিন নাকি এই ফল খেলে সাপের বিষ শরীরে কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। এছাড়াও মান্যতা আছে যে, দশহরা পূজার দিন বৃষ্টি পড়লে সাপের বিষ নির্বিষ হয়ে যায়। জেলার তালডাংরা, শীতলাডিহি সহ বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে ‘দশহরা’ পালন করা হয়। তবে বাঁকুড়ার অযোধ্যা গ্রামে খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে এই উৎসব পালিত হয়। এখানে দশহরায় সর্পদেবী মনসা ‘কালীবুড়ি’ নামে পূজিত হন। সাড়ম্বরে পালিত হয় ‘মনসা গাজন’। মাথায় ঘট নিয়ে ভক্ত্যাদের অবিরাম নৃত্য ও ‘অগ্নিবারা মন্ত্র’ (মা মনসাকে স্মরণ করে পা দিয়ে আগুন নেভানো) এই গাজনের অন্যতম আকর্ষণ।

ইঁদপরব - ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে 'ইঁদপরব বা ইঁদপূজা' অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজায় কোন মূর্তি থাকে না। পরিবর্তে বন থেকে সংগৃহীত দীর্ঘ দু-তিনটি শাল গাছ কেটে তার ডাল পালা ছাঁটা হয় এবং আগাগোড়া কাপড় জড়ানো হয়। এর মধ্যে একটি গাছের আগায় একটা বড়ো ঝুড়িকে বসিয়ে কাপড়ে মুড়ে অনেকটা ছাতার মতো রূপ দেওয়া হয়। একেই 'ইঁদ' বলে। বাঁকুড়া জেলার খাতড়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে এই পূজা সাড়ম্বরে পালিত হয়। ইঁদ পূজার গৌরবময় ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় এটি প্রথমে আদিবাসীদের উৎসব ছিল। পরবর্তী কালে সামন্ত প্রভুরা এই পূজার তত্ত্বাবধায়ক হন-

> “এই ইঁদপূজা বা পরব সাঁওতাল জাতির-তা অন্য দিক থেকেও অনুমান করা যায় হিন্দু সামন্তরাজা বা ভূস্বামীদের এ অঞ্চলে বহু পূজা উৎসব পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেগুলিতে সাঁওতালরা যোগ দেয় না। তারা এই ইঁদপূজায় বা দলে দলে এসে অংশগ্রহণ করে ইঁদের ডাংয়ে বা বেদীতে খই-দৈ ও সদ্য অঙ্কুরিত ডাল কলাই অর্ঘ্য দেয়।”[১২]

পূজোর নৈবেদ্য হিসেবে আতপ চাল, বিভিন্ন রকমের ফল, মিষ্টি, খই, দই নিবেদন করা হয়। এই ভাবেই 'ইঁদপরব' পালিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, কালের বিবর্তনের সাথে সাথে জনজীবনেও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। আর তাই বর্তমানে এই সব লোক উৎসবগুলির জনপ্রিয়তা ও জাঁকজমকও ক্রমশই ক্ষীয়মান। হাইটেক যুগে গতির সাথে পাল্লা দেওয়া নতুন প্রজন্মের কাছে অনেক আচার অনুষ্ঠানই যে আজ অবহেলিত একথা বলাই বাহুল্য মাত্র। তবুও ক্ষীণস্রোতা নদীর মতো আপন ধারায় বহমান এইসব লোক উৎসব জীবন, সংস্কৃতি ও পরম্পরায় আজও দীপ্তিমান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 247 - 254
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রানিবাঁধের বিক্রমডিহি গ্রামের বড়াম পূজা

সহরায় ও বাঁধনা পরব উপলক্ষে মহেশপুর গ্রামে গরুখুঁটা

Reference:

১. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, ‘বাংলার লৌকিক দেবতা’, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৭৮, বৈশাখ ১৩৮৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ. ৭১
২. কামিল্যা, চৌধুরী মিহির, ‘বাঁকুড়া জেলার লোকধর্ম ও লোকদেবতা’, পশ্চিমবঙ্গ বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা ১৪০৯, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রধান সম্পাদক, তারাপদ ঘোষ, পৃ. ১৩১
৩. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, ‘বাংলার লৌকিক দেবতা’, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৭৮, বৈশাখ ১৩৮৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ. ১৪২
৪. মন্ডল, নমিতা, ‘বাঁকুড়া জেলার পার্বণ ও মেলা’, পশ্চিমবঙ্গ বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা ১৪০৯, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রধান সম্পাদক, তারাপদ ঘোষ, পৃ. ১৩৬
৫. তদেব, পৃ. ১৩৮
৬. তদেব, পৃ. ১৩৮
৭. তদেব, পৃ. ১৩৯
৮. তদেব, পৃ. ১৩৯
৯. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, ‘বাংলার লৌকিক দেবতা’, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৭৮, বৈশাখ ১৩৮৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ. ১৭৯
১০. তদেব, পৃ. ১৩৩
১১. সামন্ত, ড. রবীন্দ্রনাথ, ‘বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা’, প্রথম প্রকাশ, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পৃ. ৭৩
১২. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, ‘বাংলার লৌকিক দেবতা’, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৭৮, বৈশাখ ১৩৮৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯, পৃ. ১৪২

ক্ষেত্রসমীক্ষা :

১. তনুশ্রী মাহাত, বয়স - ৬০, গ্রাম – ডুমুরতোর, থানা - হঁদপুর, জেলা – বাঁকুড়া
২. বাপী মুকুটি, বয়স - ৬১, গ্রাম – কুমিরদ্যা, থানা – বাঁকুড়া সদর -১, বাঁকুড়া
৩. অসিত মন্ডল, বয়স - ৬৫, গ্রাম – তিলাবনী, থানা – হিড়বাঁধ, জেলা – বাঁকুড়া
৪. সতীরানী সেনগুপ্ত, বয়স - ৮৫, গ্রাম – মলিয়ান, থানা – হিড়বাঁধ